জন্মদিনের সালতামামি

ভোরের কাগজ
তা: ২৭।১২।১৩
পৃষ্ঠা: ১৬

কা ম রু ল হা সা ন

২২ শে ডিসেম্বর আমার জন্মদিন। কুয়াশাঢাকা শীতের এক প্রভাতে অর্ধ শতাব্দীরও কিছু আগে আমি এই পৃথিবীতে আসি, আসার সৌভাগ্য হয়, কেননা প্রতিটি মানবশিশুর জন্মই তো অজস্র ভ্রূণসম্ভাবনার একটি; আমি না হয়ে জন্মাতে পারতো আমার ভাই কিংবা বোন। মাতৃনদীতে পিতৃপ্রেরিত আরো অজস্র শুক্রভেলার সাঁতারে আমিই প্রথম ফিতে স্পর্শ করেছিলাম। আমি মা-বাবার প্রথম সন্তান। স্বভাবতই আমাকে পেয়ে আমার মা-বাবা অসম্ভব সুখী হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য হবে না যে আমার জন্মের সময়ে মা-বাবা ছিলেন তরুণ বয়সের এক দম্পতি, মায়ের বয়স তখন কেবল ষোল, বাবার আঠারো। আজকের দিনে এটা বিরল হলেও সেই সময়পর্বে সেটাই স্বাভাবিক ছিল। পিতা হবার জন্য আমার সদ্যযুবক বাবা প্রস্তুত ছিলেন না। বিষয়টি তাকে এতোটাই বিব্রত ও লাজুক করে তুলেছিল যে তিনি আমার জন্মের কথা শুনেও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কর্মস্থল কুষ্টিয়া থেকে গ্রামে চলে আসেননি। কয়েকটি দিন মুখ লুকিয়ে ছিলেন। পরে গ্রামে এসে নানাবাড়িতে আমাকে দেখে কয়েক মাইল দূরে তাঁর নিজের বাড়িতে গিয়েও কয়েকটি দিন ফিরে আসেননি। এর পাঁচ বছর পরে আমার বোনের জন্মের সময়ে অবশ্য তাঁর এ লজ্জাবোধ ও সঙ্কোচ পুরোপুরি কেটে গিয়েছিল।

আমার জন্ম শরীয়তপুরের এক গ্রামে, নানাবাড়িতে। গ্রামটির নাম ডামুড্যা। ওই অবহেলিত অঞ্চলের একটি অগ্রসর উপজেলা। নানাবাড়িটি ডামুড্যা বাজারের প্রায় লাগোয়া, এর সমুখেই উপজেলাটির সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা যদিও শহরে চাকরি করতেন, আমার জন্মের পূর্বে তিনি কুষ্টিয়া থেকে মাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মায়ের পিতৃগৃহে, যেখানে মা সবচেয়ে নির্ভার, সবচেয়ে সুরক্ষিত। গ্রামে তখনো শিশুপ্রসবের আধুনিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি, শিশুদের জন্ম হতো দাইয়ের হাতে, স্বাভাবিক নিয়মে। তখন পৃথিবীতে এত শিশু রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভূমিষ্ঠ হতো না। একেকটি পরিবার বৃক্ষের ডালাপালার মতো একত্রে থাকতো। একটি শিশুর জন্ম তাই হয়ে উঠতো অনেক মানুষের আনন্দের উপলক্ষ, পারিবারিক উৎসব। আমার জন্ম হয় যে দাইমার হাতে তিনি নাকি বেশ সুন্দরী ছিলেন দেখতে। ছিলেন বেশ কিছু মাতৃসম আত্মীয়া। তাদেরই একজনকে আঁকড়ে ছিলেন আমার মা, অসম্ভব বেদনায়। জন্মের ষষ্ঠদিনে মওলানা ডেকে মিলাদ পড়ানো হয়েছিল আর আয়োজন করা হয়েছিল প্রীতিভোজের। গ্রামে জন্ম নেবার এই বিষয়টি আমার 'গ্রাম সিরিজ' কবিতায় ফুটে উঠেছে, যার প্রথম পঙ্‌ক্তি -'আমার জন্ম গ্রামে, প্রাকৃতিক প্রসবের পর গ্রামসীমা প্রভূত বাড়াল'।

বছরে তো ৩৬৫ দিন, ৩৬৫ দিনই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু জন্মদিন বিশেষ। এই দিন আমি যেন শিশু হয়ে যাই। জন্মদিনের এই এক জাদুকরী স্পর্শ, সে মনে পড়িয়ে দেয় সূচনার কথা, উৎসের কাহিনী। কোনো শিশুরই তার জন্মবৃত্তান্ত মনে থাকে না, স্রষ্টা বা প্রকৃতি শিশুর স্মৃতিকে অত গোড়া থেকে ভারাক্রান্ত করতে চাননি। আমারও জন্মমুহূর্তের কোনো স্মৃতি নেই, থাকবার কথাও নয়। অন্য শিশুদের মতোই আমি তা শুনেছি আমার মায়ের মুখে। আর ছোটবেলার অন্যদের তোলা ছবি দেখে ধারণা পেয়েছি দেখতে আমি কেমন ছিলাম। প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে আমি দেহের তুলনায় বড় আকৃতির মাথার শিশু। শুনেছি জন্মের সময়ে আমি মাকে অনেক যন্ত্রণা দিয়েছি, পুরো এক রাত্রির যন্ত্রণা দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম পৌষের এক শিশিরস্নাত প্রভাতে। তখন নানাবাড়িতে কাচারিঘরে একজন শিক্ষাগুরু থাকতেন যিনি ছিলেন নানাবাড়ি সংলগ্ন ডামুড্যা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। তাঁকে সবাই মৌলভী সাহেব বলে সম্বোধন করতো। কাচারিঘরে সে রাতে আরো ঘুমিয়ে ছিলেন আমার ক'জন মামা। শেষরাতে আমার মায়ের প্রসববেদনার চিৎকার শুনে মৌলভী সাহেব তীব্রকণ্ঠে আমার মামাদের ঘুম থেকে টেনে তোলেন আর তাদের নির্দেশ দেন দৌড়ে কাছের মাদ্রাসার হুজুরের কাছ থেকে ব্যথা কমানোর জন্য পানিপড়া আনতে। মা বলেছেন জন্মের সময়ে আমার মাথা কিছুটা লম্বা হয়ে গিয়েছিল। সদ্যোজাত আমাকে কোলে নিয়ে পানপাতা আগুনে সেঁক দিয়ে আস্তে আস্তে চারপাশ চেপে চেপে তাকে গোলাকৃতি বানিয়েছিলেন আমার বড় মামী। আজ ভাবি একটি শিশু কতো মানুষের অপত্য স্নেহের ঋণ নিয়ে এই পৃথিবীতে আসে।

রাশির হিসাবে আমি হচ্ছি মকর রাশির জাতক। মকর, তবে ধনু প্রভাবিত। কেননা ২২ ডিসেম্বর হচ্ছে কোনো কোনো পঞ্জিকায় ধনুর শেষ, কোনো কোনো পঞ্জিকায় মকরের শুরু। দুটি রাশির যৌথপ্রভাবে তৈরি হবার কথা আমার চারিত্র্যবৈশিষ্ট্য, কাটবার কথা আমার জীবন। রাশিচক্র উল্টে দেখি এর কোনো কোনো বৈশিষ্টের সাথে হুবহু মিলে যায় আমার চারিত্র, কোনটির সাথে একেবারেই মেলে না। এও ভাবি সুদূরের একটি তারকামণ্ডলী কি করে বালুকণার চেয়েও ক্ষুদ্র একটি গ্রহের কোটি কোটি মানুষের মাঝে আমার ক্ষুদ্রতম জীবনকে প্রভাবিত করবে। ভাবি এই দিনটিতে সুবিখ্যাত মানুষদের সাথে কত অখ্যাত মানুষই না জন্ম নিয়েছেন এই পৃথিবীতে। কেউ কেউ কীর্তির নতুন রেকর্ড গড়েছেন, পাদপ্রদীপের আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছেন, কিন্তু বেশিরভাগই উল্লেখযোগ্যতাহীন জীবন কাটিয়ে গেছেন, রয়ে গেছেন নিরেট অন্ধকারে। কৈশোরে যদিওবা বিশ্বাস করতাম, এখন আর বিন্দুমাত্র আস্থা নেই রাশিচক্রে, অদৃষ্টগণনায়।

আজকাল ফেসবুকের কল্যাণে জন্মদিন আর গোপন থাকে না, তার আগমন জেনে যায় সকল ফেসবুক বন্ধু। তারা খুব সহজেই, প্রায় নিখরচায় জন্মদিনের শুভেচ্ছা পাঠিয়ে দেয়। কেউ কেউ ছবির কার্ড বা কেক বা ফুল জুড়ে দেয় শুভেচ্ছার সাথে। অজস্র শুভেচ্ছায় ভরে ওঠে পাতা। আগে জন্মদিনে কার্ড পাঠাতো বন্ধুরা, ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাতো কেউ কেউ, কালেভদ্রে খুব

কোনো শিশুরই তার জন্মবৃত্তান্ত মনে থাকে না, স্রষ্টা বা প্রকৃতি শিশুর স্মৃতিকে অত গোড়া থেকে ভারাক্রান্ত করতে চাননি। আমারও জন্মমুহূর্তের কোনো স্মৃতি নেই, থাকবার কথাও নয়। অন্য শিশুদের মতোই আমি তা শুনেছি আমার মায়ের মুখে

>এরপর ১৫ পাতায়

জন্মদিনের সালতামামি

১৬ পাতার পর > ঘনিষ্ঠ কেউ হয়তো কেক নিয়ে আনতো। আজকের ভার্চুয়াল পৃথিবীতে সবই ভার্চুয়াল, হাতে নেবার মতো, মুখে তুলে নেবার মতো প্রকৃত কিছু পাই না। এখন যা ঘটেছে তা হল সংখ্যার বিস্ময়কর বিস্তার। এবার আমাকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছে .. জন, যাদের বিপুল সংখ্যক আমার ছাত্র-ছাত্রী। গতবছরও প্রায় সমানসংখ্যক শুভেচ্ছা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তাদের শ্রদ্ধামেশানো শুভেচ্ছা আমাকে আপ্লুত করে আর এ প্রত্যয় জোগায় যে কর্পোরেট জগতের উচ্চবেতনের চাকরি ছেড়ে কম উপার্জনের শিক্ষকতা বেছে নিয়ে আমি কোনো ভুল করিনি। এ বছর শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন বেশ কিছু তরুণ কবি, যা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এমন অনেকের শুভেচ্ছা পাই যা প্রত্যাশার বাইরে, আবার এমনটাও ঘটে যাদের শুভেচ্ছা পেলে দিনটি হয়ে উঠতে পারতো ময়ূরের মতো পেখমমেলা, সর্বাঙ্গরঙিন তারা অনেকেই ভুলে থাকেন দিনটি। সেই চিঠির যুগে, কার্ড যখন শুভেচ্ছা বিনিময়ের জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে ওঠেনি, তখনও দীর্ঘ চিঠি লিখে আমাকে শুভেচ্ছা জানাতো যে জন, সে এখন এই ফেসবুকের জমানায়, একটি শুভেচ্ছাও পাঠায় না। কার্ড বিনিময়ের যুগেও গুটিকয় কার্ডের ভেতর অনিবার্য থাকতো তার নিজ হাতে যত্নে তৈরি করা কার্ড, একটি নয় একাধিক। এমন তো ঘটেছে বারংবার, খুব কাছের মানুষ অচেনা হয়ে যায় আর দূরের মানুষ ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে। ক'বছর আগে অভিমান করে একটি কবিতা লিখেছিলাম যার শুরুটা হচ্ছে এরূপ- আমি কারো জন্মদিন মনে রাখিনি/ লোকেরা আমারও/ প্রথামত করেনি সম্ভাষণ/ কেননা মহালোকে আজও/ রয়েছে অজস্র নক্ষত্র উদ্বোধনহীন।' জন্মদিনের সংখ্যা যতো বাড়ে জীবনজাহাজ ততোই যেন কিছু প্রিয়মুখের বন্দর ছেড়ে যায়।

আমার জন্মদিনে সবচেয়ে বেশি খুশি হয় আমার সন্তানেরা। অন্যান্য দিন আগেভাগে ঘুমিয়ে পড়লেও সেদিন ঘড়ির কাঁটা মধ্যরাত না ছোঁয়া পর্যন্ত তারা জেগে থাকবে যেন দিনটির প্রথম প্রহরেই আমাকে 'হ্যাপি বার্থডে' বলে জড়িয়ে ধরতে পারে। তারা আমাকে নিয়ে বিভিন্ন পরিকল্পনা আঁটে কী করে আমাকে 'সারপ্রাইজ' দেয়া যায়, আর করে তোলা যায় 'হ্যাপি'। আমাদের শৈশবে ঘটা করে জন্মদিন পালনের রেওয়াজ ছিল না, ফলে আজকের শিশুরা যেভাবে জন্মদিনের উৎসব না হলেই মনমরা হয়ে পড়ে আমরা যারা একটু প্রাচীন, তার ঘটা করে জন্মদিন পালিত হলেই বরং বিব্রতবোধ করি। সন্তানদের ওই তোড়জোড় দেখে আমি আমার লা[illegible]বার মতোই পালিয়ে থাকার চেষ্টা করি, পারি না। আমার সময়ের অনেক কবির মতো আমি কখনো ঘটা করে জনসমক্ষে জন্মদিন পালন করিনি, যা ঘটেছে তা গৃহের অভ্যন্তরেই ঘটেছে। সম্ভবত জন্মদিন পালন নিয়ে আমার অপ্রস্তুতি ও বিব্রতভাব কখনই কাটবে না।

যখন যুবক ছিলাম জন্মদিন তো সেই বার্তাই বলতো, এগোও, জয় করবার জন্য সমুখে গোটা পৃথিবী পড়ে আছে। আজ জীবনসূর্য যখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে, তখন জন্মদিন এই বার্তাই ছুড়ে দেয় অসমাপ্ত কাজটাজ গুছিয়ে নাও, তোমার দিন ফুরিয়ে আসছে। ভাবি কাজ কি কখনো ফুরোবে? চিকিৎসাবিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের আয়ুষ্কাল ঢের বেশি বেড়ে গেছে, এমনকি এই তরুণ মৃত্যুতে ভরপুর বাংলাদেশেও গড় আয়ু পৌঁছেছে প্রায় সত্তরের কাছাকাছি, সে সবই আশাবাদী করে তোলে আরো ঢের কাজ হাতে তুলে নেবার, মনে হয় কেন একজন সৃজনশীল মানুষের আয়ুস্কাল অন্তত একশ বছর হবে না। জন্মদিন যেন নতুন করে জন্ম দিয়ে যায় আমাকে, প্রতিটি সৃজনশীল, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, কল্যাণকামী মানুষকে। ■